বোম্বাইএর ৫০০০ সরকারী কর্ম্মচারী ছাঁটাই

গণতন্ত্রের "কাজের অধিকার" এর আসল চেহারা

মোরারজী দেশাইএর আদর্শ সমাজের নমুনা

বোম্বাই সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে এক আদেশ এই অর্থে জারী করেছেন যে, আইন পরিষদে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কমাবার যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাকে কার্য্যকরী করার জন্য এখুনি প্রত্যেকটি বিভাগে শতকরা ৫ জন করে ছাঁটাই করতে হবে এবং যাতে শীঘ্রই শতকরা উপরোক্ত হার ১০ তোলা যায় তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই আদেশের ফলে ৫ হাজারের মত কেরাণী ও পিওন বরখাস্ত হবে। ইতিমধ্যে ৫০০ কর্মচারী ছাটাই করা হয়েছে।

বোম্বাই প্রদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মোরারজী দেশাই খুব কায়দা করে বলেছেন যে, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই প্রত্যেক লোককে কাজ দেওয়া যায় না। মোরারজী মশাই এর মতে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশগুলিই কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক। আর সেখানে যে চূড়ান্ত বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং চিরকালই সে সমস্যা থাকে, একথা সকলেই জানে এবং মানেও। সুতরাং মন্ত্রী মশাই বলে বসলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন, নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যে বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকটি কর্মক্ষম নাগরিক যে সেখানে কাজ পায় এ সত্যটা আজ আর মিথ্যা প্রচার করেও চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাই পাছে ভারতীয় জনসাধারণও এই সব দেশের রাষ্ট্রাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে সেই ভয়ে প্রচার করা হচ্ছে যে ও সব দেশ ত গণতান্ত্রিক নয়. ওখানে ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত; তাই ওখানে বেকার সমস্যার সমাধান হয়েছে। পেট ভরলেও মানুষের স্বাধীনতা ওখানে নেই। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছে তাই এখানে প্রত্যেককে কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। এ কথার ধাপ্পা বোঝা দরকার।

নেতাদের কথায় বোঝা গেল, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছে। কিন্তু গণতন্ত্রটা কাদের? সকলেই কি এখানে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ভোগ করতে পারছে? স্বাধীন মত প্রকাশ ও সভাসমিতি করার অধিকার ত গণতান্ত্রিক অধিকারের গোড়ার কথা। তা কি ভারতবর্ষে আছে? তাই যদি থাকে তাহলে

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ২২শে জুন, ১৯৫০, ৭ই আষাঢ়, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

এক বাংলা দেশে ৫০ খানার মত সংবাদ পত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কেন? বলা হবে এরা সব কম্যুনিষ্ট পার্টির কাগজ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ পত্রিকা কি কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্রিকা? সম্প্রতি যে 'বর্দ্ধমানের ডাক' নামক পত্রিকা সরকারী আদেশে প্রকাশ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তাও কি কমুনিষ্ট পার্টির? এ ছাড়া বহু পত্রিকার ওপর যে নিত্য হামলা চালান হচ্ছে তাদের সঙ্গে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন সম্বন্ধ নেই। সুতরাং সরকারী অজুহাত অচল। তারপর রাষ্ট্র বিরোধী কাজের অভিযোগ আনা হয়। রাষ্ট্রের স্বার্থ কি জনতার স্বার্থের উর্দ্ধে? যে রাষ্ট্র জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করে না তাকে ভেঙ্গে জনরাষ্ট্র গড়ার অধিকার জনতার অবশ্যই আছে। আর ভারতীয় রাষ্ট্র যেখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে হাজারবার প্রমাণিত হয়েছে এবং যেহেতু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভিত্তি হল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থে দেশের প্রায় সমগ্র লোককে শোষণ করা সেইহেতু দেশের লোকের নিশ্চয়ই অধিকার আছে রাষ্ট্রকাঠামো পালটাবার। ফ্যাসিষ্টরাই বলে—রাষ্ট্র কোন অন্যায় করতে পারে না; রাষ্ট্রের স্বার্থ গোটা দেশবাসীর স্বার্থের চেয়ে বড়। তারপর সভাসমিতি করার অধিকার। ১৪৪ধারা, নিরাপত্তা আইন, ও অর্ডিন্যান্সের দৌলতে ওসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সভা করার জন্য যে সমস্ত 'পাবলিক হল' আছে যার মধ্যে সভা

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী সরকারের শান্তিরক্ষার নমুনা

চাষীদের সারাদিনের সংস্থান চাল, ডাল, নুনের ওপর কেরোসিন তেল নিক্ষেপ

কাপড়চোপড় টুকরা টুকরা করিয়া ছেঁড়া

অবশেষে গুলি চালনা

কংগ্রেসী সরকার দেশে শান্তি রক্ষার নাম করে শ্রমিক চাষী ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের ওপর নির্বিচারে জঘন্য অত্যাচার চালিয়ে চলেছে। এই সব জুলুমের কথা কংগ্রেসী জয়ঢাক জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে স্থান পায় না এবং অন্য কোন বামপন্থী পত্রিকা সেগুলি প্রকাশ করলে তাদের ওপর নেমে আসে নিষ্পেষণের খাঁড়া, কাগজ শেষ পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ধরণের খবরগুলি একেবারে চাপা দেওয়া অসম্ভব যখন হয়ে পড়ে তখন পুঁজিপতি শ্রেনী দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা গুলি সরকারী উপদেশ মত সংবাদ পরিবেশন করে। তবে পরিবেশিত খবর আসল খবরের উল্টোই হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। এতদিন ধরে প্রচার চলছিল মাদ্রাজে চাষীরা গুলি গোলা লাঠি সোটা নিয়ে অহিংস কংগ্রেসী সরকারের নিরীহ পুলিশ বাহিনীকে মেরে কচুকাটা করে ফেললেও সরকার চাষীদের ওপর কোন জবরদস্তিমূলক ব্যবহার করেনি। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীপ্রকাশম ও বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন এই বলে যে বর্ত্তমান মন্ত্রীরা চাষীর সঙ্গে সহযোগিতা করে "লাল প্রভাব" বাড়িয়ে তুলছিল। এই সব প্রচার কতদূর সত্য তার সামান্য পরিচয় মিলবে বিখ্যাত ধনী গোয়েঙ্কা পরিচালিত তেলেগু পত্রিকা "অন্ধ্রপ্রভা"র সম্পাদকীয় হতে। উক্ত পত্রিকাটি বর্ত্তমান মন্ত্রীদের সমর্থক। সুতরাং তার সম্পাদকীয় আসল অবস্থাকে অনেক ঢেকে স্বভাবতই লিখবে। তবুও যা প্রকাশিত হয়েছে তা ভয়ঙ্কর। এতে বলা হয়েছে:—"কয়েক স্থানে পুলিশ চাল, ডাল, নুন এবং অন্যান্য জিনিষ একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তাদের একেবারে অব্যবহার্য্য করে দেয়। উপরন্তু আবার কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া হয় জিনিষগুলির ওপর। তারা লোকেদের কাপড় চোপড় সমস্ত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দেয়। জালামারু, কাতুরু, মুসামান্দা প্রভৃতি গ্রামে আরও জঘন্য অত্যাচার করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনী দোষী নির্দোষ নির্বিশেষে এই সব কাজ চালাচ্ছে।..... এখন ত লাঠির চেয়ে গোলা গুলির আশ্রয় নেওয়া হয় বেশী এবং যদি কাউকে সাম্যবাদী বলে সন্দেহ করা হয় তাহলে তাকে নিকটবর্ত্তী বন বা পাহাড়ের ধারে নিয়ে যাওয়া হয় ও গুলি করে মেরে ফেলা হয়।"

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

পণ্ডিতজীর ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্য

ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষের কিছুটা মিল আছে। ভারতবর্ষে যেমন জাতীয় বুর্জোয়ারা আপোষ মারফৎ বিদেশী শোষণের হাতিয়ার সেই রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে অটুট রেখেই তা দখল করল, ঠিক তেমনি ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বুর্জোয়ারা আপোষ মারফৎ ডাচ সাম্রাজ্যবাদের তৈরী রাষ্ট্র যন্ত্রটিকে দখল করল তাকে অটুট রেখেই, আর এই রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরী হয়েছে শোষণের জন্যে, কাজেই সেই রাষ্ট্র দিয়ে দেশ শাসনের অর্থই দাঁড়ায় শোষণ করা। অথচ, এই সব ঔপনিবেশিক দেশগুলির বুর্জোয়ারা আজকের একচেটে পুঁজির দিনে একেবারে স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাতে পারে না, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাকে রফা করতেই হয়। তাই দেখা যায়, ইন্দোনেশিয়ায় বিদেশী পুঁজি খাটছে শতকরা ত্রিশ ভাগ। এবং তাদের গায়ে যাতে আঁচড়টি পর্য্যন্ত না লাগে তার গ্যারেন্টিও দেওয়া হয়েছে। কাজেই, রাজনৈতিক দিক থেকে বিদেশী সাম্রাজ্য বাদ পড়ে গেলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের কর্তৃত্ব যথেষ্ট থেকে গেছে। আর দেশ শাসনের রাজনৈতিক ক্ষমতা মিললেও অর্থ নৈতিক পরাধীনতা থাকলে তাকে যে একচেটে বিশ্ব পুঁজিবাদের তাঁবেদারী করতে হয় তার প্রমাণ চিয়াংএর চীন, বর্ত্তমান ফিলিপাইন, ভারতীয় ইউনিয়ন, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি। সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশের জনসাধারণের এতটুকু উন্নতি হয়নি আর হতেও পারে না। বরং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে পুঁজিবাদী শোষণটা মিলে জনজীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে। আর শোষণে অসন্তুষ্ট জনতার বিক্ষোভ যেদিন ফেটে পড়বে, সেদিন আর আত্মরক্ষা সম্ভব হবে না। এ কথাটা চিয়াংএর পরাজয় নেহেরু সোয়েকার্ণোকে শিখিয়েছে। জনতার চোখে ধুলো দিয়ে রাখতে না পারলে এই ভুয়ো স্বাধীনতাকে চিনে ফেলা মেহনতি জনতার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। এই সব কথাই পণ্ডিত নেহেরু বেশ ভালই জানেন। কারণ এশিয়ার এখন তিনিই চিয়াংএর সর্বনাশ হবার পর। তা ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে সবার প্রথম বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশজোড়া মেহনতি জনতাকে শোষণ করার ভার নিলেন। এই কারণেই পণ্ডিতজীর হাত বেশ পেকেও গেছে। তাই তিনি ছুটে গেছেন ইন্দোনেশিয়ায় তাঁরই স্বগোত্রীয় শাসক বন্ধুদের শলাপরামর্শ দিতে। জাগজাকার্তার বিপাদলিকান্‌স্ পার্লামেণ্টের এক কমিটিতে তাই পণ্ডীতজী আভাবকের সুরে বললেন, "আপনারা নিজেদের গড়ে তুলুন।"

এই গড়ে তোলা যে কোন দিক থেকে সে বিষয়ে আজ আর কারুর কোন সন্দেহ নেই। ইন্দোনেশিয়ার চারিদিকে আজ সাম্যবাদের জোয়ার এসে গেছে— তার সীমান্তে এর আঘাত এসে লাগছে. ইন্দোনেশিয়ার মাটিতেও সাম্যবাদের বীজ বেড়ে উঠছে। কাজেই তাকে এখনই ঠেকাতেই হবে। কারণ দেরী হলে চীন-ভিয়েৎমিনের গণমুক্তি সংগ্রাম যদি ইন্দোনেশিয়ায় ভেঙ্গে পড়ে ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আজও যে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চলছে, সেটুকুও চলে যাবে। ফলে, এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদী আর থাকবে না। শুধু তাই নয়, ইন্দোনেশিয়া যদি আজ যায় ত ভারতবর্ষও তার ধাক্কায় কেঁপে উঠবে। সেই ভয় পণ্ডিত নেহেরুর আছে। তাই তিনি সেখানে বললেন, "এশিয়ায় যা কিছু ঘটুক না কেন তার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষে হবেই। আর আজ আমরা কি করব তাই হচ্ছে আজকের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা।"

আজ এই নেহেরু-সোয়েকার্ণোর মতলব কি তা ভাল করে বোঝবার দিন এসেছে শান্তিপ্রিয় মেহনতি মানুষের। কারণ ওদের কাজ হচ্ছে মেহনতি মানুষকে মারার চক্রান্ত। তার প্রমাণ পণ্ডিত নেহেরু দিয়েছেন। আজ তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়ার ক্ষুধিত মানুষের বাঁচবার লড়াইকে, তাদের এই লড়ায়ের নেতা সোবিয়েৎ, চীনকে, তার দর্শন সাম্যবাদকে দুনিয়ার বুক থেকে উচ্ছেদ করা। তাই তারা আজ আর এক সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি গড়ছে। ইউরোপের অর্দ্ধেক আজ তাদের হাতছাড়া, এশিয়ার অর্দ্ধেকও নাগালের বাইরে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া গেলেই এশিয়ায় এদের দিন শেষ হতে দেরী হবে না। কারণ চীন-সোবিয়েতের বিরুদ্ধে লড়তে হলে সামরিক দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে হারান যেমন অপূরণীয় ক্ষতি তেমনি এখানকার সাম্যবাদী আন্দোলন জয়ী হলে ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি লাল হতে দেরী হবে না। তাই সীডনি সম্মেলনে স্থির হল যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্যে সাহায্য দান শুধু কমনওয়েলথের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, তার বাইরেও তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপরেই, বাণ্ডুই সম্মেলনে সারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির মধ্যে টেনে নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাকা ব্যবস্থার ষড়যন্ত্র হল। পণ্ডিত নেহেরু ইন্দোনেশিয়ায় গেলেন এই সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করতে। তার প্রমাণ পণ্ডিতজী নিজেই দিয়েছেন— তিনি সেখানে সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতার বদলে আলোচনা করতে চেয়েছেন কয়েকটি সাধারণ স্বার্থ বিশিষ্ট বিশেষ ধারা নিয়ে, যেমন সাম্যবাদ। কাজেই দেখা গেল, পণ্ডিতজীর ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্যে নয়, লৌকিকতা রক্ষা নয়, কিংবা 'পিতা পুত্র' সম্পর্ক পাতাতে নয়, তাঁর ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে মারবার জন্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ষড়যন্ত্র পাকা করা।

'গণদাবীর' উপর সরকারী কোপ

'গণদাবী' বিক্রয়ের জন্য কমরেড সুবোধ দাস গ্রেপ্তার

গত ১৪ই মে তারিখে বেলা ১০টার সময় মালদহের এস, ইউ, সি কর্মী কমরেড সুবোধ দাসকে স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় তাঁহার হাতে ৪ খানা মে দিবস সংখ্যা 'গণদাবী' ছিল। পুলিশ অফিসারটিকে গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানান যে, যেহেতু 'গণদাবী' বেআইনী পত্রিকা সেইহেতু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কমরেড দাস, 'গণদাবী' বে-আইনী পত্রিকা নয় একথা বলিলেও এবং অবশেষে 'গণদাবীকে' বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ সরকারী আদেশ দেখিবার দাবী করিলেও তাঁহাকে কোন কিছু না দেখাইয়াই গ্রেপ্তার করা হয়। অবশেষে বেলা ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখার পর তাঁহাকে পুলিশ কোর্টে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু সেদিন রবিবার থাকায় তাঁহাকে ৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাইবার পর মিঃ গাঙ্গুলী নামক জনৈক কর্মকর্তার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখান হইতে সাড়ে পাঁচটার সময় তাঁহাকে জেলে চালান দেওয়া হয়। সারা দিন তাঁহাকে এক মুঠা চিড়া ভিন্ন অন্য কিছু দেওয়া হয় না এবং জেলেও তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য করা হয়। ইহাতেও কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ বিভাগের তৃপ্তি মেটে না। পরের দিন কমরেড দাস ৫০০ টাকার জামিনে ছাড়া পাইলে পুলিশ আবার পেছু নেয় এবং ১৬ই মে তারিখে তাঁহাকে গোয়েন্দা অফিসে ৩ ঘণ্টা আটকাইয়া রাখিয়া নানা প্রশ্ন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কংগ্রেসী সরকার জানে, 'গণদাবী' ভারতবর্ষের প্রগতিশীল জনতার নিকট কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদের জুলুমবাজী ও নানা অপকর্মের কথা প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস সম্বন্ধে তাহাদের মোহমুক্তি ঘটাইতেছে এবং কি উপায়ে এই ফ্যাসিবাদ খতম করিয়া জনরাষ্ট্র কায়েম করিতে হইবে তাহার বৈজ্ঞানিক পথ দেখাইতেছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভয় রাজনৈতিক, শ্রেণী সচেতন শোষিত মেহনতী মানুষ। তাই মিথ্যা প্রচারের মারফৎ জনসাধারণকে তাহারা দেশের আসল অবস্থা জানিতে দেয় না। 'গণদাবী' পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের মিথ্যার বেসাতি ও ধাপ্পাবাজীকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া তাহার আসলরূপ দেখাইতেছে বলিয়াই তাহার উপর সরকারী কোপ। গরীব জনতার প্রাণের কথা কোন দিনই স্থান পাইবে না পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে। অথচ জনতাকে সংঘবদ্ধ হইতে হইলে তাহার মতামত প্রকাশের মাধ্যম চাই। সেই মাধ্যম 'গণদাবী'। তাই জনতার নিজস্ব পত্রিকা 'গণদাবীর' উপর কংগ্রেসী সরকারের এই ধরণের ফ্যাসিষ্ট জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলুন।

ক্যালকাটা কম্যার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে বাস্তুহারা প্রতিনিধিদের সম্মেলন

সংযুক্ত বাস্তুহারা কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রস্তুতি কমিটি গঠিত

'গণদাবীর' প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর বাস্তুহারাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে আহ্বান

গত ৪ঠা জুন, রবিবার, কলিকাতা কম্যার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে বাস্তুহারা শিবির ও উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল সংযুক্ত বাস্তুহারা কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রস্তুতি কমিটি গঠন। প্রায় তিন শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভার নির্দিষ্ট সভাপতি কমরেড সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী সময়মত উপস্থিত হইতে না পারায় কমরেড জীবন লাল চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। পরে সত্যপ্রিয় বাবু আসিলে তিনিই সভা পরিচালনা করেন।

সভার প্রারম্ভে কমরেড অম্বিকা চক্রবর্ত্তী উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতায় একটি কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। ইহার পর কমরেড জীবন লাল চট্টোপাধ্যায় ও সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী বক্তৃতা দিলে 'গণদাবীর' প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বাস্তুহারা সমস্যার উদ্ভব, উদ্ভাস্তুর উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং কি করিলে সেই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে বলেন। তিনি আরও বলেন—"বাস্তুহারা সমস্যা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; তাই তাহার সমাধানও বিচ্ছিন্নভাবে হইবে না। পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রে খাদ্য, পরিধান, বাসস্থান, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনতা যে সংগ্রাম চালাইতেছে সেই সংগ্রামের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে বাস্তুহারা সমস্যা সমাধানের পথ। সুতরাং সমাজতন্ত্রের জন্য বৃহৎ লড়াই এর পরিপূরক হিসাবে এই সংগ্রাম পরিচালিত করিতে হইবে। ইহার জন্য আশু প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধতা। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না ঐক্যবদ্ধতা ঐক্যবদ্ধতার জন্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য; তাই বাস্তুহারাদের দাবী এবং সেই দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রামের কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করিয়া এই ঐক্যবদ্ধতা গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ যে প্রতি কমিটি গঠিত হইতে যাইতেছে তাহাতে গৃহীত কর্মসূচী বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও শিবিরে প্রচার করিয়া popularise করিতে হইবে, তাহার ভিত্তিতে তলা হইতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই আন্দোলনের মধ্যে হইতেই জন্ম লইবে প্রকৃত কেন্দ্রীয় পরিষদ। তাহা না করিয়া শুধু যদি কোন এক সভায় গঠিত একটি কমিটি বাস্তুহারাদের উপর চাপাই দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাকে যে নামই দেওয়া হউক না কেন, তাহাকে নিখিল বঙ্গ কিংবা অখিল ভারত যত বড় বিশেষণে শোভিত করা হউক না কেন, তাহা অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মত মৃত ও অকর্মণ্য হইতে বাধ্য। বাস্তুহারা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে যথেষ্ট, আশু দরকার বৃহত্তম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া তোলা।" ইহার পর আরও কয়েকজন প্রতিনিধি বক্তৃতা দেন এবং পরিশেষে বাস্তুহারাদের দাবী দাওয়ার চার্ট পঠিত এবং একটি বাস্তুহারা সম্মেলন নিকট ভবিষ্যতে করিবার জন্য প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইলে সভার কাজ শেষ হয়। এই প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন, কমরেড সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তী।

সেন্ট্রাল টি বোর্ডে কর্ম্মচারী ছাঁটাই

পুনর্গঠনের নামে প্রায় ২০০ জন কর্ম্মচারী বরখাস্ত

অথচ ১ জন বড় কর্ত্তার বদলে ৩ জন নিয়োগ

সেন্ট্রাল টী বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী এস, কে সি হ ২০০ জন কর্ম্মচারীর ওপর ছাঁটাই এর নোটিশ দিয়েছেন। ছাঁটাইয়ের অজুহাত হল, বিভাগটি নতুন ভাবে পুনর্গঠিত হবে। গত বছর সেন্ট্রাল টি বোর্ড অ্যাক্ট অনুসারে বিভাগটি পুনর্গঠিত হয়। যাতে করে চায়ের বাজারকে সংগঠিত করা যায়, আরও ভালভাবে চায়ের প্রচার করা সম্ভব হয় এবং সংখ্যা-তত্ত্ব প্রভৃতি সংগ্রহে অযথা দেরী না হয় এই ছিল গতবারের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য! বর্ত্তমানে যত কর্ম্মচারী আছে তাদের কাজগুলি সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় উঠছে না অথচ আবার পুনর্গঠনের নাম করে এই রকম বিরাট ছাঁটাই করা হল।

অবশ্য অজুহাত হিসেবে যেটা বলা হয়েছে, সেটা হল আসলে ধাপ্পা। এই ছাঁটায়ের পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য আছে; সে উদ্দেশ্য হল লুটেপুটে খাওয়া। পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষমতা হাতে এলে লুঠের মাল ভাগাভাগির পালা পড়ে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী বিভাগে এর প্রমাণ মিলেছে হাজার বার। এখানেও সেই দশা—অল্প বেতনের গরীব কর্ম্মচারীদের মেরে বড় বড় মোটা মাইনেওয়ালাদের পেট ভরান হচ্ছে। ২০০ জন সাধারণ কর্ম্মচারী ছাঁটাই করা হচ্ছে অথচ আগে যেখানে ৩০০০, টাকার একজন কমিশনার কাজ চালাচ্ছিল সেখানে মাসিক ৮০০০, টাকা খরচ করে তিন জন কর্ম্মকর্ত্তা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগে বাড়ী ভাড়া বাবদে ধার্য্য ছিল মাসিক ১৭০০ টাকা, আজ তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬২০০, টাকা। আর আগে যেখানে প্রতি ১০০ পাউণ্ড চায়ের ওপর সেস ছিল ১৷৷৵০ আজ তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৲ টাকা। এই বাড়তি টাকা জনসাধারণকেই বইতে হবে আর তার সবটুকু উপস্বত্ত আরাম করে চুমুক দিয়ে পান করবে কয়েকজন পেট মোটার দল।

ভারতবর্ষে চায়ের ব্যবসা পরিচালিত করে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। বাংলার পাটমিলের শতকরা ৮০ জনের মত যেমন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের (নেতাজী সুভাষ রোড নাম হলেও আসলে ক্লাইভের বংশধরদের রাজত্ব চলছে ওখানে) সাহেবের অধিকারে, সারা ভারতবর্ষে চায়ের ব্যাপারও তেমনি। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যেই মুনাফা যা হয় তা মূলধনের পাঁচ সাত গুণের মত। বৎসরে ২০ কোটি টাকার মত কর পায় সরকার এই ব্যবসাটি হতে। তবুও ২০০ জন কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করা হল।

ছাঁটাই কর্ম্মচারীরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রতিকারের আশায়। এ আবেদনের ফল যা হবে তা জানাই আছে। যে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার পোষ্য প্রাদেশিক সরকার গুলি নির্ব্বিচারে লাখে লাখে শ্রমিক কর্ম্মচারী ছাঁটাই করে চলেছে তারা প্রতিকার করবে এ আশা থাকলে বুঝতে হবে ভোগার দিন আরও অনেক আছে। আবেদন নিবেদনে কোনও দিন কোন কিছু দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দরকার। সেই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে ছাঁটাইকে রোধ করা সম্ভব হবে। আবেদন নিবেদনের পালা ছেড়ে তারই চেষ্টা আজকের কর্ত্তব্য।

আলীপুরে ক্ষেতমজুরের জমায়েত

ক্ষেতমজুর ফেডারেশনকে শক্তিশালী করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

গত ২৮শে মে, রবিবার জয়নগর থানার অন্তর্গত আলীপুর গ্রামে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের শাখা কার্য্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে আলীপুর বিদ্যালয় গৃহে একটি সভা হয়। সভায় প্রায় শতাধিক ক্ষেতমজুর উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কৃষক নেতা কমরেড আবদুল হান্নান গাজী।

সভার প্রারম্ভে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ছাত্র ব্যুরোর সংগঠক কমরেড নীরেন্দু ব্যানার্জী ৪৭ সালের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কংগ্রেসী সরকার কিরূপ জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্য করিয়া আসিতেছে তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী চরিত্র সকলকে ভালভাবে বুঝাইয়া দেন। ইহার পর বক্তৃতা করেন ২৪ পরগণা জিলা ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের সম্পাদক ও বাংলা প্রাদেশিক যুক্ত কিষাণ সভার সহঃ সম্পাদক কমরেড সুধীর ব্যানার্জী। দিনের পর দিন বিশেষ করিয়া ক্ষেত মজুরের অবস্থা কোন অবস্থায় নামিয়া আসিতেছে পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ফলে তাহা তিনি অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেন। কায়েমী স্বার্থ রক্ষাকারীরা দাঙ্গা প্রভৃতি উপায়ে কেমন করিয়া শোষিত জনতার নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি বাধাইয়া দিয়া তাহাদের সংগ্রামশীলতা ও ঐক্যবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া দেয় এবং সেই সুযোগে আরও শোষণ করে তাহা বুঝাইবার কালে তিনি বলেন—"গরীবের আলাদা আলাদা জাত নাই, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি আলাদা আলাদা ধর্ম্মও নাই। তাহাদের জাত এক; তাহারা সকলেই শোষিত জাতির অন্তর্গত। তাহাদের ধর্ম্মও এক; শোষণকে ধ্বংস করিয়া সুখী সমাজ গড়ার জন্য সংগ্রামই তাহাদের ধর্ম্ম। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন সংগ্রামও তাই থামিতে পারে না।" ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের পতাকাতলে সমবেত হইবার আহ্বান জানাইয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করেন। এস, ইউ, সির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অপরেশ চ্যাটার্জী চাষী ও ক্ষেতমজুরের লড়াইকে কলকারখানার শ্রমিকের লড়াই এর সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাকে রাজনৈতিক রূপ দিবার জন্য বলেন। দলের স্থানীয় কর্মী কমরেড অম্বরালি নস্কর প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফলতা লাভ করিয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে ফেডারেশনকে আরও শক্তিশালী করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। কৃষক সংগঠক কমরেড কৃষ্ণ ব্যানার্জী বিশ্ব পুঁজিবাদী যুদ্ধ চক্রান্তকে ব্যর্থ করিবার জন্য শান্তি সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার ডাক দেন। কমরেড আইয়ুব নবীর বক্তৃতার পর কমরেড সভাপতি অভিভাষণ দেন এবং অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

মিশরকে সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ চক্রান্তের ভাগী করতে চায়

ইজভেস্তিয়া থেকে

[illegible] বছর ধরে মিশরের জনগণ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে আসছে। যখনই জোরাট গণআন্দোলন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখনই ব্রিটিশ শাসকরা একবার করে "পূর্ণ স্বরাজ" দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় অর্থাৎ ধোকাবাজী করে।

সামন্ত জমিদারকুল আর বুর্জোয়াদের দেশদ্রোহী অংশের ওপর নির্ভর করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজের আধিপত্যকে ঢেকে রাখার জন্য নানা রকম চাল চেলে আসছে।

১৯১৪ সালে মিশরকে ব্রিটিশ রক্ষাধীন করা হয়; ১৯২২ সালে মিশরকে "স্বাধীন রাজ্য" ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ জোর করে মিশরের ঘাড়ে এক সামরিক চুক্তি চাপিয়ে দেয়। সেই চুক্তির সর্ত্তগুলো আসলে আজও কাজ করছে, যার ফলে স্বদেশে মিশরের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ এবং বৈদেশিক নীতিতে তো বটেই। সুয়েজ অঞ্চলে ব্রিটেন সশস্ত্রবাহিনী রাখবার অধিকার (কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় ৮ বছরের জন্য) আদায় করে নিল, যুদ্ধ বাধলে সামরিক ও বিমান ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের এবং অন্যান্য এই ধরণের অধিকার আদায় করে নিল যার ফলে আজও মিশরের ওপর ব্রিটেনের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

চুক্তিতে মিশরকে নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনী রাখবার অধিকার দিলেও, এই বাহিনীর সংগঠন ও শিক্ষার ভার রইল ব্রিটিশ সামরিক মিশনের ওপর। সুদান আজও ব্রিটিশ বড়লাট শাসিত।

চুক্তিতে যত ব্রিটিশ সৈন্য মিশরে রাখার ব্যবস্থা আছে, রাখছে কিন্তু তার [illegible]গুণ। মিশরে ব্রিটিশ অনেক সামরিক ঘাঁটি গড়ছে যাতে করে মিশরকে আরব প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে শক্ত ঘাঁটি হিসাবে কাজে লাগান যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মিশরের স্বাধীনতার প্রশ্ন আবার নতুন করে দেখা দেয়। শ্রমিক নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে এক শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দেখা দেয়। জনগণের দাবী হল প্রধানতঃ দুটি:—(১) ইঙ্গ-মিশরী চুক্তি বাতিল করতে হবে, (২) ব্রিটিশ সৈন্য রাখা চলবে না। ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে

এল ভালোতিনা

মিঃ বেভিনের মিশরী শাসকদের সঙ্গে গুপ্ত চুক্তি করার এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল যে সিদ্দকী পাশার সরকারকে গদি ছাড়তে হোল। গেল তিন বছরে মিশরে বারকতক মন্ত্রীসভা বদল হোল কিন্তু কোনটাই "ব্রিটিশ অভিভাবকতার" হাত থেকে মিশরকে মুক্ত করার চেষ্টা করল না।

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে মিশরীর শাসকের মুখপাত্রেরা ব্রিটেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এক নতুন ইঙ্গ-মিশরী চুক্তির প্রস্তাব করলেন। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ ধ্বনিত হোল। রক্ষণশীল পত্রিকা "অল জেরিদা" লিখল:—এই সব আবেদনের অর্থ কি? এতদিন আমরা বলছিলাম যে আমাদের দেশ থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং নীল নদের উপত্যকাকে ঐক্যবদ্ধ না করা পর্য্যন্ত আমরা ব্রিটিশের সঙ্গে কোন আপোষ আলোচনা করবে না। আজও ব্রিটিশরা আমাদের দেশ দখল করে বসে আছে। আমরা আর নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি চাই না। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে আপোষ আলোচনায় কোন লাভ হবে না। অতীতে আমরা দেখেছি যে ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের ক্ষতিই হয়। ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত আলোচনার প্রশ্ন তোলাই উচিত নয়।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তারা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মিশরের বুকে বসে যুদ্ধের জাল বুনছে; তাই তারা কিছুতেই সৈন্য সরাতে রাজী নয়; গেল বছরের শেষের দিকে ব্রিটিশ যুদ্ধসচিব মিঃ শিনওয়েল তো একথা বলেই দিয়েছেন। নতুন ছলে, মিথ্যা প্রচারের আড়ালে ব্রিটিশ মিশরে কায়েম থাকবার এবং প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে।

১৯৩৬ সালে ওয়াফদ মন্ত্রিসভার সাহায্যেই ব্রিটিশের পক্ষে মিশরের ওপর দাসত্ব চুক্তি চাপান সম্ভব হয়েছিল। ওয়াফদ হোল মিশরের সব চেয়ে বড় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল। ব্রিটিশ চেষ্টা করছে যে আবার ওয়াফদ দলের হাত ধরে নিজের কার্য্যসিদ্ধি করে নেওয়া যাবে। সাদিষ্ট এবং অন্যান্য নিয়মতান্ত্রিক দলগুলি সামন্ত জমিদার আর দেশদ্রোহী বুর্জোয়াদের দল হিসাবে ঘৃণিত। তাছাড়া সাদিষ্টরা ক্ষমতা পেয়ে খুব মার্কিন ঘেঁষা ভাব দেখিয়েছেন।

১৯৪৯ সালের ৬ই নভেম্বর সম্রাটের নির্দ্দেশে মন্ত্রিসভা মেয়াদের দুই বছর আগেই ভেঙ্গে দেওয়া হোল। জনগণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও নির্ব্বাচনের সময়ে সামরিক আইন জারী করা হোল জনগণের প্রতিবাদকে কণ্ঠরুদ্ধ করার জন্য। এই রকম পরিবেশে নির্ব্বাচন হোল। মোট ৩১৯ আসন, মধ্যে মধ্যে ওয়াফদ দল পেল ২২৮টি। ভোট পাবার দিকে লক্ষ্য রেখে ওয়াফদ দল নির্ব্বাচনী প্রচারে বল্লে ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ তারা চায়, সামরিক আইন রহিত করা তাদের দাবী। কিন্তু নাহাসের ওয়াফদ মন্ত্রিসভা বাহ্যিকভাবে সামরিক আইন প্রত্যাহার করলেও, কড়া সেন্সর ব্যবস্থা চালু রাখল, গণতান্ত্রিক নেতাদের নিপীড়ন চালাতে লাগল এমন কি সুয়েজ, সিনাই এবং লোহিত সাগর অঞ্চলে সামরিক আইনে পর্য্যন্ত তারা হাত দিল না।

সরকারী ভাবে একদিকে ওয়াফদ মন্ত্রিসভা ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ দাবী করল। অন্যদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল ব্রিটেনের সঙ্গে নতুন চুক্তি করার তোড়জোড়। দপ্তর বিলীন মন্ত্রী হামিদ জাকী-বে বলেছেন যে "ব্রিটেনে নির্ব্বাচনের পরেই ইঙ্গ-মার্কিন আলোচনা সুরু হবে এবং লক্ষ্য হবে পশ্চিমী ব্লকের ঢঙে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির মধ্যে একটি জোট পাকান।"

এই চক্রান্ত ব্রিটিশের আক্রমণাত্মক চক্রান্তের (মার্কিন অনুপ্রাণিত) সঙ্গে দিব্য খাপ খেয়ে গিয়েছে। ব্রিটেন মিশরকে দারুণভাবে অস্ত্রসজ্জিত করে চলেছে। ট্যাংক, জেট চালিত বিমান, ডুবোজাহাজ, কামান এই সব পাঠাচ্ছে। মিশরের মোট বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ শুধু অস্ত্র কেনার পিছনে খরচ হচ্ছে। ১৯৪৯-৫০ সালে যত অস্ত্র আনা হয়েছে এত আর কখনো হয় নি। নতুন নতুন সৈন্য এনে (মিশরের সরকারের অনুমতি না নিয়ে) ব্রিটিশ সুয়েজ অঞ্চলে আরো ২০ কিলোমিটার স্থান দখল করে নিয়েছে এবং সেখানে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করছে। এইজন্য মিশরের জনমত এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে মিশর সরকার ব্রিটিশকে সৈন্য আনা নেওয়া বন্ধ করতে বলতে বাধ্য হন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও লুকোচুরি কিছু নেই। প্রকাশ্যভাবেই তারা মিশরকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ঘাঁটি করে তোলায় মন দিয়েছে। সেইজন্যই তারা প্রস্তাবিত ভূমধ্য সাগরীয় ব্লকে মিশরকে টানার চেষ্টা করছে। মার্কিনরা মধ্যপ্রাচ্যকে নতুন করে নিজেদের সুবিধামত ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য ব্রিটিশের সঙ্গে গুপ্ত শলাপরামর্শ করছে।

১৯৪৯ সালে ঘোষিত "যান্ত্রিক সাহায্যের" অজুহাতে আমেরিকা মিশরের ওপর মার্শালী করণের ফাঁস গেঁথে দেবার চেষ্টা করছে এবং সেই উদ্দেশ্যে কায়রো এবং স্তানবুলে মার্কিন কূটনৈতিকদের গুপ্ত বৈঠক হয়ে গিয়েছে। মিশরের জনগণকে লুকিয়ে মার্কিন আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মিশরকে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের জালে জড়াবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

কিন্তু দীর্ঘকালের ব্রিটিশ শাসকের অভিজ্ঞতা মিশরের জনগণ উপেক্ষা করেনি। তারা জানে কারা তাদের স্বাধীনতা আর সার্ব্বভৌমত্বের পথে বাধা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জাতির মত মিশরের জনগণও তাদের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতার লড়াই-এ নেমে আসছে। পৃথিবীর শান্তি আর গণতন্ত্রের শিবিরে তারা নিজেদের যায়গা করে নিচ্ছে। —টাস

শ্রমিক বিলের প্রতিবাদে মিলিত সভা

ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার দাবী

গত ...শে যে তারিখে বেলুড়ে স্থানীয় আর, ..., পি, সোস্থালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, ..., পি, টি, ইউ, সি ও ইউ, টি, ইউ সি... কর্মীদের উদ্যোগে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের এক সভা হয়। ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সম্পাদক কমরেড দেবপ্রিয় দাসের সভাপতিত্বে এই সভা ভারতীয় পার্লামেণ্টে যে শ্রম আইন (লেবার রিলেসন্স বিল) আনা হইয়াছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং ইহাকে রোধ করিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত আন্দোলনের কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে। কৌশলে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সরকার ও কোম্পানীর ... আনিবার জন্য যে আইন এই বিলের মারফৎ বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সহিত একমাত্র হিটলারের শ্রমনীতিরই তুলনা হইতে পারে—বিলটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণীকে ফ্যাসীবাদের ... বলি দেওয়া। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা হইতে এই সত্য পরিষ্কার হয়।

এই সভা হইতে দল ও মত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলিকে একত্রিত হইয়া সভায় গৃহিত যুক্ত কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে স্থানীয় যুক্ত আন্দোলন গড়িবার আহ্বান জানান হয়। ১৪৪ ধারা, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য বে-আইনী কালাকানুনের সাহায্যে যে ভাবে জনসাধারণের প্রাথমিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হইতেছে সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অবিলম্বে ঐ সমস্ত বেআইনী ব্যবস্থার প্রত্যাহার দাবী করে।

বিভিন্ন বামপন্থী দল ও সংগঠন এবং শ্রমিক ইউনিয়ন হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় সভায় গৃহিত প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যকরী করার জন্য।

লক্ষ্য করিবার বিষয় আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও সোস্থালিষ্ট পার্টি এই সভায় যোগদান করে নাই। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; কারণ সোস্থালিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধতা চায় না। অশোক মেহতা তাঁহার এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে পরোক্ষে এই কথা বলিয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক যেহেতু হিন্দ-মজদুর সভার জয়প্রকাশী সোস্থালিষ্ট নেতৃত্ব কোম্পানী ও ফ্যাসীবাদী কংগ্রেসী সরকারের দালাল শ্রমিক সংগঠন আই, এন, টি, ইউ, সির সহিত একসঙ্গে কাজ করিবার চুক্তি করিয়াছে। আই, এন, টি, ইউ, সির লক্ষ্য ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া পুঁজিবাদী শোষণকে কায়েম রাখা। তাহার সহিত চুক্তির অর্থই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ বাড়াইয়া তোলা। সোস্থালিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব সেই চেষ্টাই করিতেছে। তাই তাহারা ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সভায় যোগ দেয় না।

কংগ্রেসী সরকারের শান্তি রক্ষার নমুনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একেই বলে সুশাসন। কংগ্রেসী নেতাদের কাছে কংগ্রেসী না হলেই যে হয়ে গেল দেশদ্রোহী। সুতরাং যে মানুষ নয় এবং সে দোষী কিনা তা তদন্ত করা কিংবা তার বিচার হওয়ার দরকারও নেই। ইচ্ছেমত কুকুর বিড়ালের মত গুলি করে মেরে ফেললেই হল। যদি জনসাধারণের কেউ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তাহলে বলে দিলেই হল—এ সব মিথ্যে কথা নয়ত দেশদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড, এই জাতির গাল ভরা বড় বড় বুকনি। তাতে সে সন্তুষ্ট না হলে দেশ-দ্রোহী বলে বিনা বিচারে তাকেও কারারুদ্ধ করা হবে নয়ত ধন, পাহারা ও গুলি ত ইংরেজ আমলে শাসক ইংরেজ যখন এখনকার মন্ত্রীদের প্রায় রাজার হালে রাখবার ব্যবস্থা করেছিল বন্দীত্বের দশায় তখন তাঁরা বিনা বিচারে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে বলে হাপুস নয়নে কান্নাকাটি করেছিলেন জনতার দুয়ারে। জঙ্গী জনতা সংগ্রাম করে, খুন ঢেলে নেতাদের মুক্ত করেছে বার বার আর এখন ক্ষমতা হাতে পেয়ে সেই জনতার বুকের রক্ত টেনে বের করছে সত্যাশ্রয়ী গান্ধী ভক্তের দল। জনতা আজও প্রস্তুত হতে পারেনি তাই এ অত্যাচার সইছে। তবে সহের দিন যে শেষ হয়ে আসছে এও ঠিক। সেদিন এ জুলুমের যোগ্য প্রত্যুত্তরই মিলবে, ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

গণদাবীর চাঁদার হার

বার্ষিক ৩৲ (তিন টাকা)

ষান্মাষিক ১৷৷৹ (দেড় টাকা)

রথীন সেন

ম্যানেজার গণদাবী

ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট হলে

১লা জুন আন্তর্জ্জাতিক শিশু দিবস প্রতিপালন

কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই শিশুদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

গত ১লা জুন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক সভায় আন্তর্জাতিক শিশু দিবস প্রতিপালিত হয়। কয়েকটি বামপন্থী দল ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড দিগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভার কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে সভাপতি বলেন যে, একটি সর্বভারতীয় শিশু প্রতিষ্ঠান আছে আর তার কর্ম্মকর্ত্তারা আজ রাষ্ট্র যন্ত্র পরিচালিত করছেন, তবুও দেশে শিশু শোষণ রয়েছে। এর কারণ বর্ত্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'গণদাবীর' প্রধান সম্পাদক, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী বলেন যে, কংগ্রেসী নেতাদের শিশু রাষ্ট্রের দাঁতের কামড়ের যন্ত্রণা বড়রা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন; যেখানে পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, মাথা গুঁজবার জন্য এতটুকু স্থান নেই, বেকারত্ব, অনাহার আর অপমৃত্যু ভারতীয় গণজীবনের নিত্যসাথী, সেখানে শিশুদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজ আমলে বর্ত্তমান মন্ত্রীরা লম্বা লম্বা বক্তৃতায় বলেছিলেন, শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির মেরুদণ্ড। অথচ ক্ষমতা দখলের পর শিশুদের জন্য কিছু করা দূরে থাকুক, তাদের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়েছে। যে দেশে বাপ মা, খেতে পায় না, বাবা হয়েও খেতে দিতে না পারায় ছেলে মেয়েদের কুপের মধ্যে ফেলে দিতে হয়, মা হয়ে মেয়েকে বিক্রি করে নিজের পেটের ভাত জোগাড় করতে হয় সে দেশে স্বভাবতই নবাগত শিশুকে ভাবা হয় জঞ্জাল। শিশু জন্ম নেয় অনাথ আতুর হিসেবে; তাইত আতুর ঘর বলা হয়। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে শিশুমৃত্যুর হার ভারতবর্ষে এত বেশী—শতকরা ১৭জন। যে কোন সভ্যদেশের পক্ষে এটা লজ্জা ও কলঙ্কের; কিন্তু কংগ্রেসী রামরাজত্বে নয়। যেহেতু এটা হল হনুমান রাজত্ব। শিশুদের দুধ খাওয়ার উপদেশ শিশু সভায় লাট বেলাটদের দিতে শোনা যায়। কিন্তু যেখানে এক-মুঠো ভাত জোটে না সেখানে দুধ যে বিলাসিতা এ কথাটা এদের মগজে ঢোকে না। এরা সেই ফরাসী দেশের রানীর মত যিনি জনতা রুটী রুটী করে চেঁচাচ্ছে শুনে বলেছিলেন জনতা যদি রুটী না পায় ত কেক খায়না কেন? ভারতবর্ষের শতকরা ৮০টি ঘরের ছেলেরা দুধের মুখ দেখতে পায় না—এ সত্যটা কংগ্রেসী নেতাদের অজানা। ভারতবর্ষে জন প্রতি দুধের গড় খরচ আধ আউন্স। তারপর শিশু বড় হল খাদ্যাভাবে স্বাস্থ্য ও মনে অপরিণত হয়ে; তার শিক্ষার দরকার। কে দেবে, রাষ্ট্র? সমগ্র জনকল্যাণ খাতে খরচ হয় মোট বাজেটের শতকরা ৪ ভাগ, শিক্ষাখাতে এর মধ্যে হল ২ভাগ। ইংরেজ আমলে শিক্ষার জন্য যা খরচ হত আজ তার চেয়ে কম করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ কংগ্রেসী সরকার চায় না দেশবাসী শিক্ষিত হোক। এর প্রমাণ মিলবে স্কুল কলেজের সংখ্যা না বাড়িয়ে স্কুল কলেজে ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া। তাও আবার তাদেরই পড়তে দেওয়া হবে যারা কংগ্রেসী অভিধান মতে ভাল চরিত্রের। যারা দেশের ভালর জন্যে সংগ্রাম করছে তারা আজ bad কিংবা doubtful characterএর আর বিশেষ পড়ার বিশেষ ধরণের লোকরাই হল সৎ চরিত্রের। তা ত হবেই; কারণ পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের এখনকার দরকার ত সুস্থ সবল শিশু কিংবা শিক্ষিত কিশোর যুবক নয়, তার দরকার অশিক্ষিত সৈন্যদল। তাইত মোট ব্যয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ ব্যয়িত হচ্ছে সামরিক খাতে। তার ওপর হাজারে হাজারে শিশুকে কুলী মজুর হিসেবে খাটান হচ্ছে খনি, কারখানা আর চা বাগানে প্রায় বিনা মজুরীতে বললেই হয়। এদের কারও কারও দিনে ১২ ঘণ্টা ডিউটি পর্য্যন্ত আছে। ভারতবর্ষে শিশুদের এই সাধারণ দুরবস্থার ওপর আর এক দুর্বিপাক নামিয়ে আনার ষড়যন্ত্র চলেছে। ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের সঙ্গে খাদি সুতোর গাঁটছড়া বেঁধে ঘুরছে নেহেরু প্যাটেল চক্র এবং ভারতবর্ষকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। যুদ্ধ হওয়ার অর্থ লাখে লাখে শিশুর প্রাণবলি। তাকে রুখতেই হবে; শ্রমজীবি জনতা তাকে রুখবেও আন্দোলনের মারফৎ। আর সেই আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিয়ে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙবেই ভাঙবে। কোন ট্রুম্যান, কোন এটলি, তাকে রোধ করতে পারবে না; এটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার ভয় দেখিয়ে প্রগতিকে বন্ধ করা যায় না। আমেরিকার কোটি

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার গণজাগরণে ভীত পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ খাঁ

চূড়ান্ত মধ্যযুগীয় শাসন ও নিষ্পেষণের মধ্যেও পূর্ব্ব পাকিস্থানের প্রগতিশীল শক্তির সংগ্রাম

সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা ও স্বজন পোষণের প্রতিরোধে মুসলীম ছাত্র সমাজ

'গণদাবী' সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নীতীশ দাস সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন :—

"পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁ তাঁহার সদ্য আমেরিকা সফরের এক বক্তৃতায় বহু বিঘোষিত শরীয়তী শাসনের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পাকিস্থানে কখনও সাম্যবাদ প্রসার লাভ করবে না। পাকিস্থানের অর্থনীতি এমন সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে প্রতিটি মানুষ সেখানে সুখী ভবিষ্যৎ রচনা করতে প্রয়াস পাচ্ছে। যে সমস্ত "উন্মাদ" শ্রেণী সংগ্রামের বুলি কপচাচ্ছেন, তাঁরা যেন একবার পাকিস্থান ভ্রমণ করে জনাব সাহেবের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেন। তাঁরা দেখবেন পাকিস্থানের প্রতিটি নাগরিক ধনী নির্ধনী নির্ব্বিশেষে রাষ্ট্রের খেদমৎ করে যাচ্ছেন।

"এহেন প্রশংসিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের আসল অবস্থা যে খাঁ সাহেবের দৃষ্টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে, তা সত্যি নয়। বিদেশ থেকে মোটা রকমের একটা অংক তাঁর পাতে পড়বে বলেই তাঁকে এই মিথ্যা কথার পিরামিড সৃষ্টি করতে হয়েছে। অপদার্থ চিয়াংকে সাহায্য করার মতো ধৈর্য্য যে আজকে আমেরিকার নেই এ কথা স্পষ্টভাবে জানা আছে খাঁ সাহেবের। লিয়াকৎ সরকার যে পাকিস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই হিসেবে আমেরিকার ঋণ যে কত নিরাপদ একথা প্রমাণ করার জন্যেই জনাব খাঁ সাহেবের এই বাকচাতুর্য্য। পূর্ব্ব পাকিস্থানের প্রান্ত সীমা, বার্ম্মায় ঘূর্ণায়মান পরিস্থিতি—লাল চীনের অভ্যুত্থান—দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দিকে দিকে গণজাগরণের ঢেউ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাধান্য লাভ প্রভৃতি পটের পর পট পরিবর্তনে লিয়াকৎ সাহেবের মত পুঁজিপতিদের দালালদের ভয় হবারই কথা। এই জাগরণের ঢেউকে পূর্ব্ব পাকিস্থানে প্রতিহত ও পাকিস্থানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করার জন্যই জনাব লিয়াকৎ সাহেব যে নতুন পথ খুঁজছেন। হিন্দু মুসলমান দাংগা এর ভূমিকা মাত্র।

"কিন্তু লিয়াকৎ সাহেব সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ওপর যতই অনাস্থা স্থাপন করুন না কেন—শ্রেণী-সংগ্রামকে যতই হেসে উড়িয়ে দিন না কেন, ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ এবং সমাজের গতি কখনও ব্যাহত হবে না। তার প্রমাণ মিলতে আরম্ভ করেছে পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিল্পাঞ্চলে, গ্রামে, বস্তিতে। সেখানে নীচের তলাকার শোষিত মানুষ স্বার্থান্বেষী দলীয় অপপ্রচারকে উপেক্ষা করে আশ্রয় দিয়েছে অসহায় নারী, পুরুষ, শিশুকে—মহল্লায়, পাড়ায় 'আমান কমিটি' গঠন করেছে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে। নিজেদের ঐক্যকে তারা রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কলকাতায় জাতীয়তাবাদী নামধারী, আসলে সাম্প্রদায়িক পত্রিকাগুলোও সাহস পায়নি এই দৃষ্টান্তকে অস্বীকার করতে। কিন্তু এরা ঘটনাগুলোকে—উদার হৃদয় মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুরক্ষা নামে অভিহিত করেছেন এবং খেটে খাওয়া মজুর কৃষকের দাঙ্গা প্রতিরোধের কথা এড়িয়ে গেছেন। তার প্রমাণ মিলবে, চট্টগ্রামের সহর বাজারে—মোমেন সাহীর কিশোরগঞ্জে, বরিশালের কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে, ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র, ঢাকার শ্যামপুর, টেখরিয়া, আমিনপুর, তেজরাৎখালি, নোয়াখালির চৌমুহনী, বজ্রীপুর, শানগর, নিরদপুরের কয়েকটি অঞ্চলে। দাংগা প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট বিনষ্ট করেছেন, জনপ্রিয় নেতা সামসুদ্দিন ইক্‌বাল হোসেন, আকবর করিম, রুপালি সাহা প্রভৃতি বড় ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করে।

"কিন্তু এত কাঠ খড় পুড়িয়েও মোসলেম লীগ গভর্ণমেণ্ট গণআন্দোলনের স্রোতকে আটকে রাখতে পারেন নি। দাংগা পরবর্ত্তী অবস্থা, যা আমি সাম্প্রতিক পূর্ব্ব পাকিস্থান পরিভ্রমণ করে লক্ষ্য করেছি একথার সাক্ষ্য দেবে।

"পূর্ব্ব পাকিস্থানের যে সমস্ত অঞ্চলগুলো দাংগায় বেশিরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে স্থানীয় গরীব মুসলমানগণ এক একটা মণ্ডলী গঠন করে রক্ষা করছে। কলকাতা হ'তে আগত "মোহাজের" (বাস্তুহারা) রাও সেখানে আশ্রয় পাচ্ছেন না। এইসব অঞ্চলেই গরীব মুসলমান জনসাধারণের চোখে প্রতিনিধিমণ্ডল সংখ্যালঘু যারা এখনো বাস্তুত্যাগ করেন নি তাদের কাছে গিয়ে তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন; তাদের সাম্প্রতিক অভাব-অভিযোগ ধৈর্য্যের সংগে শুনছেন ও প্রতিকারের কর্ম্মপন্থা সংগে সংগে গ্রহণ করছেন। যে সমস্ত হিন্দু বাস্তুভিটা বিক্রি বন্দোবস্ত বা ভাড়া দেওয়ার জন্যে ফিরে আসছেন, প্রতিনিধিমণ্ডলের নেতা তাঁদের সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি আত্মীয় পরিবার পরিজনদের ফিরিয়ে আনবার জন্যে অনুরোধ করছেন। কিছু কিছু ক্ষেত মজুর, ভাগ-চাষী, জেলে, ধোপা, নাপিত পশ্চিমবংগে প্রাণের দায়ে বাস্তুত্যাগ করেছিলেন তাঁরা আবার প্রাণ রক্ষার জন্যে ফিরে এসে নিজ নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করছেন প্রতিবেশী মুসলমানদের সহায়তায়।

"নেহরু লিয়াকতের দিল্লী-চুক্তি যেখানে কাগজে শোভিত হচ্ছে, রেডিওতে ঘোষিত হচ্ছে। বড়লোকের প্রাসাদে প্রাসাদে বিড়লা ডালমিয়া খৈতান ইস্পাহানি রনদা সাহার মুনাফা লোটার অবাধ স্বাধীনতা মঞ্জুর করছে, সেখানে গরীব জনসাধারণ হিন্দু মুসলিম বিভেদ ভুলে শ্রেণী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা আবার করছে।

"পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট মোহাজেরনদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করবেন। পাকিস্থান বেতারের এই পৌনঃপুনিক ঘোষণায় বাস্তব প্রকাশ হোল :—

ঢাকা সহরের মোহাজেরনদের অবস্থা চরমে এসে পৌচেছে! কুর্মীটোলার আশ্রয় শিবিরে প্রায় ৩৭,০০০ মোহাজেরিন আছে (সরকারী হিসেবে ৬৫,০০০, বাড়িয়ে বলা হয়েছে সরকারী প্রচারের স্বার্থে) তন্মধ্যে ১৫,৩৭০ জন মহিলা, ৭৫১২ জন শিশু এবং অবশিষ্টাংশ পুরুষ আছে [হিসেব স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দপ্তর হ'তে গৃহিত]। পরিত্যক্ত মিলিটারী ব্যারাকে এই সব মোহাজেরন পশুর মত ঠাসাঠাসি করে বাস করছেন—বৃষ্টিতে দুর্দ্দশার চরম হয়। শিশুদের জন্যে যে শ্বেতাকার তরল পদার্থ দুধ নামে অভিহিত হয়ে বরাদ্দ হয়েছে, তাও নিতান্ত অপ্রচুর। বয়স্কদের যে শুকনো ঢেলার মত খাদ্য বিতরণ করা হয় তা তো একেবারে অখাদ্য, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজনকও বটে, বস্ত্রের অভাবে পর্দানশীণ মুসলিম মহিলারা স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারছেন না। প্রতিশ্রুত বরাদ্দ কাপড় কোথায় কোন অতল গহ্বরে চলে যাচ্ছে কেউ টের পায় না। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বাংলার সব চাল যেমন করে পাচার হয়েছিল ইস্পাহানি সাহেবের দ্বারা এখন কাপড়ও নিশ্চয়তা হচ্ছে। অভিযোগ জানালে পুলিশের ব্যাটন আছে—আনসারদের Country made gun আছে আর আছে শিশু রাষ্ট্রের দোহাই। তার পর সরকারী হিসেবে আছে ৬৫,০০০ মোহাজেরিণ অথচ বাস্তবে মহাজেরিণ হোল ৩৭,০০০, বাকি ২৮০০০ এর বরাদ্দ জিনিষপত্র কোথায় পাচার হয়ে যাচ্ছে, কউ জানে না। এরপরেও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। মহাজেরণদের ধর্ম্মান্ধতা ক্রমশঃ বাড়ছে; না খেতে পেয়ে না পরতে পেয়ে তারা কৈফিয়ৎ চাইতে সুরু করেছেন। এবং সেই কারণেই গভর্ণর মালেক ফিরোজ খাঁ নূনের ২৩শে মে তারিখে কুর্মিটোলা কোলনীতে মধুর বাণী :—

'আপনারা সরকারের কাছে রুটি চাচ্ছেন কেন? আপনাদের হাত পা আছে, নিজেরা খেটে তার ব্যবস্থা করুন। সরকারকে দোষ দিলে চলবে কেন? সেটা অত্যন্ত খারাপ কাজ। মুসলমান রাষ্ট্রের সেবা করাই আপনাদের কাজ। অথচ মন পবিত্র রেখেই এই মোহাজেরিণরা ঢাকেশ্বরী মিলে, প্রসন্ন ম্যাচ ফাক্টরিতে, হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরী, স্থানীয় অয়েল মিল, এবং ষ্টীল এণ্ড আয়রণ ফ্যাক্টরীতে কাজ চেয়েছিলেন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার দাবীতে—গভর্ণমেণ্টে থেকে ঋণ ভিক্ষা করেও অনেকে ছোট ছোট ব্যবসা, দোকান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাদের সমস্ত দাবীই অগ্রাহ্য হয়েছে।

"মলে ফ্যাক্টরীতে লোকাভাবে কাজ অনেক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথচ পারদর্শী টেকনিশিয়ান কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত মজুর নিযুক্ত হচ্ছে না। কারণ ডাকিয়ে মাথলে শেষে নামমাত্র মজুরীতে তাদের খাটান যাবে। নুন সাহেবের বাণী ধাপ্পা ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

"স্কুল কলেজ—অফিস—হাইকোর্ট সর্ব্বত্র বিশেষজ্ঞ লোকের অভাবে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সরকারের চৈতন্য নেই—উপযুক্ত লোক নিয়োগের কোন চেষ্টাই নেই। দুর্নীতি, চোরাকারবার, স্বজন পোষণের অবাধ রাজত্ব চলেছে সর্ব্বত্র—জিনিষপত্রের দর পশ্চিমবংগ হতে অপেক্ষাকৃত সুলভ হলেও সাধারণ লোকের ক্রয়ের ক্ষমতা চূড়ান্ত ভাবে হ্রাস পাওয়ার দরুণ ওপর জোর লোকদের পোষা দারো হয়েছে। গরীবদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। বরং দিনের পর দিন আরও সঙ্গীন হচ্ছে। তারা শত কাপড়, চাল, তেল প্রভৃতি মূল দ্রব্যগুলি পশ্চিমবংগের চেয়ে অনেক বেশী দরে বিক্রি হ'চ্ছে।

"এই অবস্থার প্রতিবাদে ছাত্র, কেরাণী, মজুর কৃষক দরিদ্র জনসাধারণ আজ বিক্ষুব্ধ। ঢাকাতে Central Telegraph Office এবং Foreign Accounts Officeএ ২০শে মে তারিখে দুই ঘণ্টা Pen down strike হয়েছে। তাঁদের দাবী হোল, বেতন বৃদ্ধি, মাগগী ভাতা বৃদ্ধি, ইলেকট্রিক পাখার সংখ্যা বাড়ানো, জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত, মালপত্রের গুদোমে আলো সরবরাহ। ১৫ দিন যাবত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে অভিযোগগুলি আনা সত্ত্বেও তাদের ঔদাসিন্যে কেরাণীরা নিজেরাই প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দাবীগুলো পূরণ না হলে তাঁরা ধর্মঘটের অস্ত্র প্রয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

"গণ জাগরণ যে প্রবল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে আবার দানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করেছে, তা'র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে লিয়াকৎ সাহেবের আমেরিকা সফরের বক্তৃতাগুলোকে। শুধু বহিঃশত্রুকে আক্রমণের ভয় দেখিয়ে আর ধর্মের জিগীর তুলে সব সময় এই সব ছোটলোকের দলকে ভোলান যাচ্ছে না—তাই আমেরিকান দাওয়াই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এক ঢিলে দুই পাখী মারার চেষ্টা। এক আভ্যন্তরীন বিক্ষোভকে লাঠি গুলি মেরে ও উগ্রধর্মান্ধতা প্রচার করে শুরু করে নিজের আসন নিষ্কণ্টক করা দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার খাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণশক্তির বিরুদ্ধে লড়া যায় তার জন্যে আমেরিকার সমরোপকরণে শক্তিশালী হওয়া ও সামরিক ঘাঁটি গাড়া। এই দুই উদ্দেশ্য অবশ্য একই স্বার্থে।

"কিন্তু ইতিহাসের গতিকে মার্কিণের ডলার দিয়ে প্রতিহত করা যায় না। তার প্রমাণ আজ চীনে মিলেছে। গণজাগরণের জোয়ারকে কোন দেশেই এ্যাটম বোমার হুমকি শুরু করতে পারেনি। দেয়ালের লেখা লিয়াকৎ সাহেব পড়েন নি—তাই এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

"কিন্তু পাকিস্তানের দুর্গত শোষিত মানুষদের দায়িত্ব আজ অস্পষ্ট। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক ছাত্র বুদ্ধিজীবি দরিদ্র জনসাধারণকে। যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভগুলো দিকে দিকে আবার দেখা দিচ্ছে, তা'কে সুসংহত করে রূপ দিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে—শোষণ ব্যবস্থার যন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেংগে চুরমার করে—সুখী সমাজ ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র কায়েম করার পথে। শ্রমিকশ্রেণীর দলই তা পারে—এই দলের অভাবই আজ পাকিস্থানে অনুভূত হ'চ্ছে সব চেয়ে বেশি। সেই দল গড়ে তুলতে হবে গরীব পাকিস্থান কর্মীদেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে শ্রমিক কৃষক ছাত্র মধ্যবিত্তের সংগ্রামী ঐক্যের ভেতর দিয়ে।"

সেণ্ট্রাল পি, ডবলিউ, ডি, মজদুর ইউনিয়নের বিহার প্রাদেশিক শাখার বার্ষিক অধিবেশন

কমরেড প্রীতিশ চন্দ সভাপতি নির্ব্বাচিত

সম্মেলন পণ্ড করার চেষ্টায় বিহার পুলিশ

নিখিল ভারত সেণ্ট্রাল পি. ডবলিউ, ডি মজদুর ইউনিয়নের বিহার প্রাদেশিক শাখার বাৎসরিক সম্মেলন গত ২০শে ও ২১শে মে ধানবাদে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনে পাটনা, রাঁচী, গয়া, টাটানগর, সিন্ধ্রী, ধানবাদ প্রভৃতি ইউনিয়নের বিভিন্ন শাখা হইতে প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিহারের শ্রমিক নেতা ও সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভ্য কমরেড প্রীতিশ চন্দ এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় শ্রমিকদের দুরবস্থার বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া এবং বিশেষ করিয়া সরকারী শ্রমনীতি সম্বন্ধে শ্রমিকদের সচেতন করিয়া দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানান। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—অহিংস কংগ্রেসী সরকারের কেন্দ্রীয় বাজেটের মোট ব্যয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয়িত হইতেছে আর শতকরা ১ ভাগেরও কম হইতেছে শিল্পোন্নতি বিষয়ে। শিল্পোন্নতি দূরের কথা কংগ্রেসী কর্ত্তাদের হাতে পড়িয়া হাজারে হাজারে শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লালবাতি জ্বালিতে বাধ্য হইতেছে; ফলে লাখে লাখে শ্রমিক বেকার হইয়া অনাহারে মরিতে বাধ্য হইতেছে কিংবা দুঃখের জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি খুঁজিতেছে। ক্ষমতা পাইবার পূর্বে যেখানে ৪০ হাজার টেকনিসিয়ান তৈয়ারী করিবার কথা বলা হইয়াছিল, ক্ষমতা পাইয়াও যেখানে ম্যান পাওয়ার কমিটি বসাইয়া কত লোক দরকার তাহা বাহির করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছিল আজ সেখানে সরকারী রেজেষ্টী করা বেকারের সংখ্যা ৩০ লাখ। পুঁজিবাদের ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। তাই মানুষের মত বাঁচিতে হইলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো ভাঙ্গিয়া সমাজতন্ত্র কায়েম করিতে হইবে। ইহার প্রস্তুতির জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন আই, এন, টি, ইউ, সি ও হিন্দ মজদুর সভার বাহিরে আসিয়া নিজেদের সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তোলা। বাঁচার জন্য তাহা করিতেই হইবে।"

সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহিত হয়। তন্মধ্যে সরকারী ব্যাপক ছাঁটাই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের দাবী জানাইয়া এবং নয়া লেবার রিলেসান্স বিল ও ট্রেড ইউনিয়ন বিলের তীব্র প্রতিবাদ ও এই দুইটি বিলের প্রত্যাহার দাবী করিয়া দুইটি প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত শ্রমিকদের বুনিয়াদী দাবী সম্বন্ধীয় একটি ১৫ দফা সম্বলিত চার্টার অফ ডিমাণ্ডস প্রস্তাব আকারে গৃহিত হয়।

আগামী বৎসরের জন্য কমরেড প্রীতিশ চন্দকে সভাপতি এবং কমরেড এইচ, পি, বিশ্বাসকে সম্পাদক করিয়া একটি শক্তিশালী কার্য্য নির্বাহক কমিটি গঠিত হয়।

এই সম্মেলনকে পণ্ড করিবার জন্য বিহার পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। অধিবেশনের কয়েকদিন আগে হইতেই কমরেড চন্দকে তল্লাসী এবং বিভিন্ন শাখা হইতে আগত প্রতিনিধিদের নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। স্থানীয় শ্রমিকদের গ্রেপ্তারের এবং এমন কি মারপিটের ও ভয় দেখান হয়। ইহাতে সফল না হইয়া তাহারা হাল ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সভা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কমরেড চন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশেষে জামিনে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শোষিত মেহনতকারী জনতার
একমাত্র সাপ্তাহিক
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দি মুখপত্র
হামারা পথ
কার্য্যালয় ঃ—৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫

বোম্বাইএর ৫০০০ সরকারী কর্ম্মচারী ছাঁটাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করতে হলে সরকারী অনুমতির দরকার হয় না আইনত, সেখানে হলের কর্ত্তৃপক্ষের ওপর নোটীশ দেওয়া হয়েছে, সরকার বিরোধী কোন দলকে সভা করার জন্য হল ভাড়া দেওয়া চলবে না। সরকার অনুমতি দিলে তবে ভাড়া দেওয়া যাবে। সুতরাং সরকার বিরোধী কোন দলই আজ সভা করতে পারছে না অথচ দেশের বেশীর ভাগ লোকের গণতন্ত্র, যা কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভব, তার কথা ছেড়ে দিলেও যদি কংগ্রেসী নেতাদের গণতন্ত্র অর্থাৎ বুর্জোয়াগণতন্ত্রের কথাই ধরা হয় তাহলেও প্রত্যেকটি লোকেরই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অধিকার আইনতভাবে আছে। ভারতবর্ষে এখন তাও নেই; অর্থাৎ ভারতীয় রাষ্ট্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অধিকারটুকুও দিতে নারাজ। এর কারণ ভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের ফাসিবাদী নীতি। এ ছাড়াও ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্রে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে প্রত্যেক লোকের কাজের অধিকার আছে। জনতার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। ভারতীয় রাষ্ট্র তা কি দিচ্ছে? শুধু দিচ্ছে না তাই নয়, বড় বড় বুকনির আড়ালে mass scale এ ছাঁটাই করা হচ্ছে। তাহলে গণতন্ত্রটা রইল কোথায়? বড় লোকদের বেলায় গণতন্ত্রটা আছে বাস্তবে। তারা ইচ্ছেমত সভা সমিতি করতে পারছে, জনসাধারণকে শোষণ করতে পারছে, গরীবের রক্ত শুষে মুনাফার পাহাড় তুলতে পারছে, ভুখা মজুর চাষী মধ্যবিত্তের দল ভাত কাপড় চাইলে গুলি গোলা লাঠি মেরে তাদের যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারছে এ কাজটা তারা নিজেরা না করে সরকারকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। আর গরীব জনতার বেলায় গণতন্ত্রটা রয়েছে কাগজ পত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বাস্তবে তার কোন প্রয়োগ নেই। তাই গণতন্ত্রকেও দু-ভাগ করা হয়—বুর্জোয়া গণতন্ত্র যা ইংলণ্ড, আমেরিকা ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে কমবেশী চলছে আর সর্বহারার গণতন্ত্র যা সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে চালু। প্রথমোক্ত দেশে স্বাধীনতার মানে হল বড়লোকের শোষণ করার অধিকার আর গরীবের শোষিত হওয়ার অধিকার; বাস্তবে ধনিক শ্রেণীর একাধিপত্য বা ডিক্টেটরী। আর শেষোক্ত জনতার গণতন্ত্র। যার ৯৯ লক্ষ্য হল শতকরা জনের শোষণ মুক্ত সুখী স্বাধীন জীবন। পুঁজিবাদী দেশে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না, হতে পারে না কারণ কম মজুরীতে মজুর পাবার জন্যই পুঁজিপতি শ্রেনী বেকারের দল সৃষ্টি করে। কংগ্রেসী রামরাজত্বে তাই বেকারত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে।

শুধু বোম্বাই নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশেই আজ নির্বিচারে ছাঁটাই হচ্ছে। একে প্রতিরোধ করতে হলে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। চাকুরীর স্থায়িত্ব, বাঁচার মত মজুরী এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করতে হবে মজুর কেরানী ভাইদের। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গুলিকে এই কর্ম্ম-পন্থার ভিত্তিতে মিলিত হতে বাধ্য করুন। নিজেদের বাঁচার পথ, ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেরাই হাতে তুলে নিন। তাতেই আসবে সুদিন।

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কোটি ডলার, অফুরন্ত সৈন্য যুদ্ধ সম্ভার চিয়াংকে বাঁচাতে পারে নি, নেহেরু প্যাটেল চক্রকেও পারবে না। আর সেই সুদিনে বর্ত্তমান সমাজের গলিত মৃতস্তূপের মধ্য থেকে উঠবে নতুন সুখী সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সেখানেই শুধু শিশুদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান দিয়ে কমরেড ব্যানার্জী বক্তৃতা শেষ করেন।

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির প্রমোদ সেন, ইনষ্টিটিউট অফ্ আর্ট এণ্ড কালচারের পক্ষ থেকে তাপস দত্ত, বি, পি, টি, ইউ, সির পক্ষ থেকে সুকোমল চ্যাটার্জী, উইমেন্স কালচারাল এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে গায়ত্রী দাশগুপ্তা, গণতান্ত্রিক নারী সংঘের তরফে রিণা দেবী, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সত্যপ্রিয় রায়, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ষ্টুডেন্টস ব্যুরোর সুকোমল দাশ-গুপ্ত প্রভৃতি আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

সভায় এস, ইউ, সির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, সেণ্ট্রাল পি, ডবলিউ ডি, মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড প্রীতিশচন্দ্র, মার্টিন এণ্ড বার্ণ কোম্পানী কর্মচারী সমিতি ও মার্কেনটাইল ফেডারেশনের সম্পাদকদ্বয় সভার উপস্থিত হতে না পারায় বাণী পাঠান। সেগুলিও সভায় পড়া হয়।

বড় বড় জোতদারদের ধান মকুব

গরীব চাষীর ধান লুঠ

পশ্চিম বাংলা সরকারের ধান্যক্রয় নীতি

মথুরাপুর থানার অন্তর্গত রাণাঘাটা, কৌতলা, বাইস হাটা প্রভৃতি কয়েকস্থানে সরকারী ধান ক্রয়ের অজুহাতে পুলিশ ও প্রোকিওরমেণ্ট অফিসার যে ভাবে চাষীদের উপর জুলুম করিতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোন কোন স্থানে পুরুষ অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতেও জোর করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গোলা ভাঙ্গিয়া ধান লইয়া যাওয়া হইতেছে। বহু ক্ষেত্রে খোরাকী ও বীজ ধান পর্য্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। অনুরোধ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না এবং আপত্তি করিলে ত কথাই নাই—অপমানিত হইতে হয়। ইহার উপর পুরুষ চাষীদের জোর করিয়া আটক রাখা হইতেছে এবং টাকা দিলে তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। সংবাদে প্রকাশ, একটি গরীব মজুরের সারাবৎসরের আয় আটমন ধান কাড়িয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে যদিও তাহার পরিবারের আহারের জন্যও উহার বেশী ধান দরকার। অথচ ঐ একই গ্রামে বড় বড় জোতদারদের যে সমস্ত গোলা আছে তাহাতে হাত দেওয়া হয় নাই।

যে সমস্ত জায়গায় ধান ধরা হইতেছে সেখানে বর্ত্তমান চাল প্রতিমণ ১৭ টাকা ১৮ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে অথচ সরকার ধানের মণপ্রতি ৭৷৷০ টাকার বেশী দিতেছে না এবং গরীব চাষীর সমস্ত কাড়িয়া লইতেছে। পুরন্দরপুর গ্রামের কয়েকজন গরীব চাষী কনট্রোলড দামে আটক ধান তাহাদিগকে বিক্রয় করার জন্য অফিসারটিকে অনুরোধ করিলে তাহাদিগকে দুর্বৃত্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার গালাগালি দিয়া এবং গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

সরকারের কমদামে ধান ক্রয় করার নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে চাষীদের প্রায় অনাহারে থাকিবার মত অবস্থা দেখা দিয়াছে। একদিকে যথাসর্বস্ব সরকার কাড়িয়া লইতেছে অন্যদিকে চড়া বাজার দামে কিনিবার মত সম্বল নাই, দামও মিলিতেছে না। ফলে বর্ষা পড়িবার আগেই ইতিমধ্যে ঘর বাড়ী, থালা, ঘটি বন্ধক দিয়া দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তাহাদিগকে করিতে হইতেছে।

বাংলার গরীব চাষীদের কয়েক টাকা বেশী দিতে পশ্চিম বাংলা সরকারের গায়ে বাজে অথচ বর্ম্মা মুল্লুক হইতে আরও নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধান মণ প্রতি ১০।১১ টাকা বেশী দিয়া কিনিতে আপত্তি নাই। যেহেতু সেই টাকা মালিক পুঁজিপতি শ্রেণীর পকেটে যাইবে কিংবা বর্ম্মা সরকারের নিজের দেশের চাষী মজুর গুলি করিয়া মারিতে কাজে লাগিবে! ইহা হইতেই বুঝা যায় বর্ম্মার পুঁজিপতির দল ও বাংলার পুঁজি-পতি শ্রেণীর উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী হইলেও তাহাদের স্বার্থ এক—গরীবকে শোষণ করাই তাহাদের লক্ষ্য। বাংলার চাষীর মুখের ভাত কাড়িয়া বাংলা সরকার বর্ম্মা সরকারকে খয়রাতি করিতেছে লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানকার চাষীদের গুলি করিয়া ঠাণ্ডা করিতে, যেহেতু বর্ম্মার চাষী মজুররা বর্ম্মার পুঁজি-বাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেদের রাষ্ট্র কায়েম করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন জমিদারী, জোতদারী প্রথার বিলোপ না ঘটিতেছে, যতদিন না ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন চাষীর দুঃখ ঘুচিবেনা, তাহাদের উপর জুলুমের মাত্রা কমিবে না। তাই চাষী ভাইদের আজ কর্ত্তব্য নিজেদের সংঘবদ্ধ করা ও নিজেদের সংগঠন মারফৎ লড়াই করা! এই উদ্দেশ্যে যুক্ত কিষাণ সভা ও ক্ষেত মজুর ফেডারেশন পতাকা-তলে সমবেত হউন।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্‌সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত